স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের মাতৃস্মৃতি

রাণী চন্দ

গত শতকের প্রখ্যাত শিল্পী ও লেখিকা

[১৯৫০ সালে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হয়। প্রখ্যাত শিল্পী ও লেখিকা রাণী চন্দ (১৯১২—১৯৯৭) সেবার কুম্ভস্নান করতে গিয়ে হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনের তাঁবুতে ছিলেন। সেখানে তিনি স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (রামময় মহারাজ) ও অন্যান্য সাধুদের সঙ্গ করে কিছু মূল্যবান স্মৃতি তাঁর বিখ্যাত 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পূজনীয় **স্বামী চেতনানন্দজী** ওই গ্রন্থ থেকে [বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৯] শ্রীশ্রীমায়ের এই স্মৃতিকথাটি চয়ন করে 'নিবোধত' পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছেন। সংকলনের বানান অপরিবর্তিত।—সম্পাদিকা]

শশী মহারাজের [স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দ, ১৮৯৫—১৯৬১] ছোটোখাটো সুখস্মৃতিগুলি শুনতে বড়ো ভালো লাগে। সন্ন্যাসীর মনে সাধারণ মানুষের এই-যে কোমলতা, এ অন্তর স্পর্শ করে। বড়দির বড়ো আকাঙ্ক্ষা, শ্রীমার গল্প শোনেন এঁদের মুখে। বলেন, ''বইয়ে যা পড়ি, তৃপ্তি হয় না। তাঁর নিজ শিষ্য, যাঁরা মার অতি কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের কাউকে পেতাম যদি তো শুনতাম বসে।''

শশী মহারাজ নিয়ে এলেন রামময় মহারাজকে। শৈশবেই তিনি মার কাছে দীক্ষা নেন। শিশুর হাসি তাঁর মুখে, মধুর কণ্ঠস্বর কথার ধ্বনিতে। গল্প বলবার ভঙ্গিটিও বড়ো সুন্দর; তন্ময় হয়ে শ্রীমার কথা বলেন। বলতে বলতে ভাবের আবেগে কোথায় চলে যান, যেন মার কোলে কচি শিশু বসে দোলা খায়। মুগ্ধ হয়ে শুনি, তাঁর গল্পের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট মাকে দেখি। যেন পরপর ছবি এক-একটি। এ আর-এক ধরনের সৃষ্টি। এর মাধুর্য আলাদা। ভিতরের সেই বিশেষ যোগাযোগ না থাকলে এমন মধুর রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারে না।

রাণী চন্দ

রামময় মহারাজবললেন, ''তখন কি ছাই অত বুঝেছি। ছেলেমানুষ ছিলুম, আদর আবদারেই কেটে গেছে সময়। মা'ও ছোট্টছেলে বলেই খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর। মার বড়ো বড়ো শিষ্যরা বলতেন, রামময় ছোটো হয়েই জিতে গেল। কত সহজভাবে মা আমাদের কত বড়ো শিক্ষা দিতেন। মার জন্মদিন। তিনি তখন আছেন জয়রামবাটিতে, ছোট্ট একখানা ঘরে। অনেক শিষ্য এসেছেন সেই উপলক্ষে। মা সবাইকে নিজের হাতে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতেন। সব কাজ নিজের হাতেই করতেন। আমি যখন প্রথম মার কাছে যাই, ভাবতে ভাবতে চলেছি, না জানি কেমন দেখব মাকে। গিয়ে দেখি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন মা—অতি সাধারণ 'মাতৃমূর্তি'—ঘরে ঘরে যেমন দেখি। অনেক দিন পর্যন্ত কথাটা মনে খচ্ খচ্ করেছে; ভেবেছি, মা কি ঘর ঝাঁটটা না দিয়ে পারতেন না? অন্ততঃ ঐ সময়টায়? শিশুমনে মার ঐ ঘর ঝাঁট দেওয়ার মূর্তিটা নিতে পারি নি সহজ মনে। খোঁচা বিঁধত। তা, সেদিন জন্মদিনে মা আমাকে বললেন, ওরা এসেছে, যাও তো কিছু দুধ জোগাড় করে আনো গাঁ থেকে; পায়েস রাঁধব। আমি তখনি ঘড়া কাঁধে বেরিয়ে গেলাম। ঘর ঘর ঘুরে আট সের দুধ জোগাড় করে আনতে বেলা হয়ে গেল। ফিরে এলে পর সবাই বকলেন, কেন এত দেরি করলে? মা বসে আছেন সেই অবধি, মুখে জল দেন নি এখনো পর্যন্ত।

"ঘরে ঢুকে দেখি মা বসে আছেন চৌকিতে পা ঝুলিয়ে। খোলা চুল। সবাই মাকে পুজো করেছেন। আমি আসতেই মা বললেন, এসেছ? এতখানি বেলা হল খাও নি কিছু। এবার তোমার পুজো সেরে নাও।''

"পাশেই একটা পাত্রে সাদা পদ্ম লাল পদ্ম ছিল; কোন্ টা নেব ভাবছি, মা বলে দিলেন, লাল পদ্ম নাও; দেখো, তুলসীপাতা লেগে নেই তো ওতে? মা'ই মন্ত্র বলে দিলেন। সেই মন্ত্র আওড়ে মার পায়ে পদ্ম দিয়ে প্রণাম করলাম। মা বললেন, রোসো, আরো দুটো পদ্ম নাও, জ্ঞান আর গিরীন আজ উপস্থিত নেই, তারা তোমায় ভালোবাসে, তাদের নামে তুমি আমায় পদ্ম দাও।''

"এই জ্ঞান-দাই আমায় প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন মার কাছে। জ্ঞান-দার কাছে দুবার আমি যা বকুনি খেয়েছি! একবার মার থালায় বসেই খেয়ে

ফেলি। আমার দোষ নয়, আমি তো তখন ছোটো, স্কুলে পড়ি। কাছাকাছি গ্রাম, শনি-রবিবার এসে মার কাছে থাকি; সোমবারে একেবারে ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরি। বাড়িতে আমার নিজের মা-বাবা অবিশ্যি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন প্রথম প্রথম; কিন্তু পরে আর কিছু বলতেন না। লেখাপড়ায়ও সকলের চেয়ে ভালো ছিলুম, সেদিক দিয়েও বলবার কিছু ছিল না। তা, সেই শনিবারে, মা জানতেন আমি আসব—তাঁর পাথরের থালাতেই প্রসাদ বেড়ে রেখে দিয়েছেন ঢাকা দিয়ে। বললেন, আগে খেয়ে নাও। সেই কখন খেয়েছ।''

"আমি তখনি বসে গেলুম খেতে। এমন সময়ে জ্ঞান-দা ঢুকে পড়লেন; বললেন, কী আক্কেল তোর; মার থালা এঁটো করে দিলি?''

"মা কিন্তু থালা আর বদলালেন না। বললেন, কী হয়েছে, ছেলে খেয়েছে তাতে কি এঁটো হয়? তুমি ওকে বোকো না জ্ঞান, ঐ পাথরেই আমি খাব।''

"আর একবার, শরৎ মহারাজের থালা এঁটো করে দিই। ঐ জয়রামবাটিতেই এসেছেন শরৎ মহারাজ; প্রায়ই এসে থাকতেন। তখন দেখেছি সে আর-এক রূপের প্রকাশ। শরৎ মহারাজ থাকতেন পাশের ঘরে। প্রতিদিন সকালে মাকে প্রণাম করতে আসবেন—আমাকে দিয়ে খবর নেওয়াতেন, যা তো, দেখে আয়, মা এখন কী করছেন। দেখে এসে বলতুম, মা এখন তরকারি কুটছেন, কি ঘর ঝাড়ছেন, কি আটা মাখছেন, বাসন ধুচ্ছেন, মশলা বাটছেন—এমনি সব। তিনি আবার সাবধান করে দিতেন, মাকে যেন কিছু বলবি নে, চুপটি করে দেখবি আর এসে আমায় বলে যাবি। পাছে মাকে বিরক্ত করা হয় তাই সাবধান করে দিতেন। শেষে, যখন এসে বলতুম মা এইবার বসে আছেন, তখন 'ঠিক বলছিস তো, ঠিক বলছিস তো' বলতে বলতে শরৎ মহারাজ উঠতেন। প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন, সেই মানুষ যখন হেলতে দুলতে মাকে প্রণাম করতে যেতেন—দেখবার মতো ছিল। শরৎ মহারাজ ঘরে ঢুকে সেই বিরাট শরীর মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করে চলে আসতেন।''

"শরৎ মহারাজের কাছে কত গল্প শুনতাম স্বামী বিবেকানন্দের। বসে বসে আমাকে শোনাতেন সেসব।''

"একবার স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎ মহারাজ আর স্বামী অভেদানন্দ [অখণ্ডানন্দ] বেরিয়েছেন—কোন্ পাহাড়ে। স্বামীজির শরীর খারাপ হল; একদিন একটু বেগুনের ঝোল খেতে চাইলেন। শরৎ মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ [অখণ্ডানন্দ] বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ির খেতে অনেক বেগুন ধরে আছে। তাঁরা দুটি বেগুন চাইলেন তা থেকে; লোকটি একটিও দিতে রাজি হল না। কী করেন তাঁরা, ফিরে চলে এলেন। শুনে স্বামীজি বললেন, তোরা আমার কিরকম গুরুভাই রে। আমার জন্যে দুটো বেগুন চুরি করে আনতে পারলি নে? শরৎ মহারাজ স্বামী অভেদানন্দকে [অখণ্ডানন্দকে] নিয়ে আবার গেলেন সেই গৃহস্থের বাড়িতে। এবার পরামর্শ ছিল, একজন গিয়ে লোকটির সঙ্গে 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' জুড়বেন, আর একজন পটাপট্ দুটো বেগুন খেত থেকে তুলে নিয়ে আসবেন।''

"এমনি সব মজার মজার কত গল্প।''

"আর একবার পাহাড়েই ভ্রমণে বেরিয়েছেন এই তিনজন। খাবার পান নি সারা দিন; ঘুরতে ঘুরতে এক অর্থবান লোকের দুয়োরে গিয়ে

দাঁড়ালেন। কিন্তু লোকটি ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, যা-তা করে তাড়িয়ে দিল তাঁদের। স্বামী অভেদানন্দ [অখণ্ডানন্দ] বললেন, এই করে হবে না। তোমরা হেসো না, দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখো। জানো না কি এদের রীতি—গাড়োয়াল সে দাতা নেহি; লাঠি বেগর দেতা নেহি।—লাঠি দেখিয়ে ভিক্ষে আদায় করব। বলে তিনি কষে মাথায় পাগড়ি বেঁধে, লম্বা একটা লাঠি হাতে নিয়ে ফের সেই গাড়োয়ালের বাড়িতেই গেলেন। গিয়ে হাতের লাঠি উঠোনে ঠুকে হুমকি দিয়ে দাঁড়াতেই সেই গৃহকর্তা ছুটে এসে পায়ে পড়ল। অখণ্ডানন্দ একবার করে হুমকি দিয়ে মাটিতে লাঠি ঠোকেন, আর বলেন, "আটা লাও", "ঘিউ লাও", "মিঠাই লাও"; আর লোকটি দৌড়ে দৌড়ে ঘর থেকে তা এনে এনে পায়ের কাছে জড়ো করে। তিনি সেইসব নিয়ে স্বামীজিদের কাছে ফিরে এলেন। তিনজনের তখন কী হাসি।''

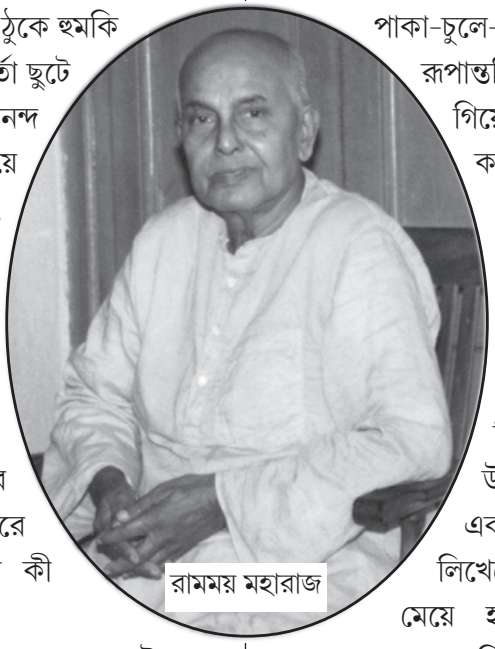
রামময় মহারাজ

"এই শরৎ মহারাজের থালাতে বসেই একদিন আমি খেয়ে ফেলি। মা তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে সেই পাতেই আমায় খেতে দিলেন। মা খেতে দিয়েছেন, ভাববার কী আছে? বসে গেলাম খেতে। কিন্তু কপালে আছে বকুনি খাওয়া—পড়ে গেলাম সেবারেও জ্ঞান-দারই সামনে।''

রামময় মহারাজের এই জ্ঞান-দার কাছেও শুনি কত গল্প মায়ের। আলাদা করে সব লিখবার মতো। মা সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন; কিন্তু এ মার আর-এক 'রূপ'। জ্ঞান মহারাজ বলেন, ''শরীরময় দগদগে পাঁচড়া, চার মাস বিছানায় ছিলুম; মা নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন, ঘা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন। মাছ খেতে পছন্দ করতাম না; মা বাড়া ভাতের ভিতরে কাঁটা বেছে মাগুর মাছ লুকিয়ে রেখে প্রতি গ্রাস মুখে তুলে দিতেন। কী, না রক্ত পরিষ্কার হবে।''

শুনি আর ভাবি, মায়ের এই 'রূপ' ছিল বলেই তো তিনি 'মা'। তাই তো তাঁর সন্তানরা আজও পাকা-চুলে-ভরা মাথা নিয়ে শিশুভাবে রূপান্তরিত হন মার কথা বলতে গিয়ে। এ জিনিস বোঝায় কে কাকে?...

রামময় মহারাজ হাসেন আর বলেন, "মাকে দেখেছি—তিনি যেন জানতে পারতেন সকলের মনের কথা, আর তাকে ঠিক সেই সেই ভাবে উপদেশ দিতেন। একবার এক মেয়ের মা মাকে লিখেছেন—বোধ হয় উকিলের মেয়ে হবেন—আট-পাতা ঠাসা জেরায়ভরা চিঠি। একটি ছেলে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল, এখন সে বিয়ে করতে চাইছে না। তবে মা একবার বললেই ছেলেটি বিয়ে করে, ইত্যাদি। মা বললেন, 'ছেলেটি তো আমায় কিছু লেখে নি, তার মনের ভাব না বুঝে আমি তাকে কী করে আদেশ করব।' ''

"কারো যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকত, মা বলতেন, 'বেশ তো, বিয়ে কি খারাপ? করবে

গুরুদাস মহারাজ

বইকি? ঠাকুর আমাকে বিয়ে করেছিলেন। দেখো-না, সব দুই দুই—রাম-সীতা দুই, লক্ষ্মী-নারায়ণ দুই, শিব-সতী দুই।'

"আবার কারও বিয়ে করবার অনিচ্ছা থাকলে তাতেও খুব খুশি হতেন—ঘুমিয়ে বাঁচবে বাছা। নয়তো আজ ও-ছেলের অসুখ, মেয়েটার কান্নাকাটি, ঝামেলার একশেষ।''

বড়দি বললেন, ''আচ্ছা, শুনেছি মা বিদেশীদের সঙ্গেও কথা বলতেন। তিনি তো ইংরেজি জানতেন না।''

যশোরের দিদি মার শিষ্যা; তিনিও বললেন যে মাকে দেখেছেন এক মেমের সঙ্গে কথা বলতে।

রামময় মহারাজ বললেন, ''সে আর-এক মজা। কী করে যে ওঁরা একে অন্যের কথা বুঝতেন তা ওঁরাই জানেন। কত বিদেশী আসত মার কাছে নানা প্রশ্ন নিয়ে; সঙ্গে অবশ্য দোভাষী থাকত। একবার তো আমিই দোভাষী হয়ে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু মিনিট খানেক যেতে না যেতেই দেখি, প্রশ্নকারী প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই মা উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন; আর সে মাথা নিচু করে শুনছে। দোভাষীর আর মুখ খুলবার সুযোগই হল না। এই তো গুরুদাস মহারাজ—ডাচ ভদ্রলোক—মার মন্ত্রশিষ্য। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মন্ত্র যে নিলেন, মার কথা বুঝলেন কী করে? তিনি হেসে বলেন, 'I understood ।' ''

গুরুদাস মহারাজকে [স্বামী অতুলানন্দ] তো দেখি রোজ। গেরুয়াতে ঢাকা টক টকে রঙের বৃদ্ধ; দু বেলা আমবাগানের লম্বা পথে খানিক পায়চারি করেন, খানিক রোদে-পাতা বেতের চেয়ারে বসে থাকেন। অন্য সাধুরাও এসে ঘিরে বসেন তাঁকে; কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হয় তাঁদের। সামনাসামনি পড়ে গেলে এগিয়ে কাছে যাই, গুরুদাস মহারাজ চলার পথে থেমে ক্ষণেক দাঁড়ান। প্রণাম করে চলে আসি, উনিও পা বাড়িয়ে সামনে হাঁটেন। সোজা পথের এদিক-ওদিক হয় না কখনো। একটি কথাও হয় নি তাঁর সঙ্গে এখনও পর্যন্ত।

আজ কী জানি কী হল, দূর হতে দেখতে পেয়ে পথ ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে এলেন আপনা হতে। একমুখ হেসে চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বললেন, 'শিবো, শিবো।'

পরশু রঙিন ফুলে নকশা কেটে সাজিয়েছিলাম ঠাকুরের বেদীর সামনেকার ভিজে মাটি। শুনেছি, ভারি খুশি হয়েছিলেন গুরুদাস মহারাজ দেখে। বলেছিলেন, ''হাতে ঢালা পূজার মন্ত্র ফুলের পাপড়ির সারিতে। নতুন জিনিস।''

তাই বুঝি তাঁর খুশিটুকু জানিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি এইভাবে।